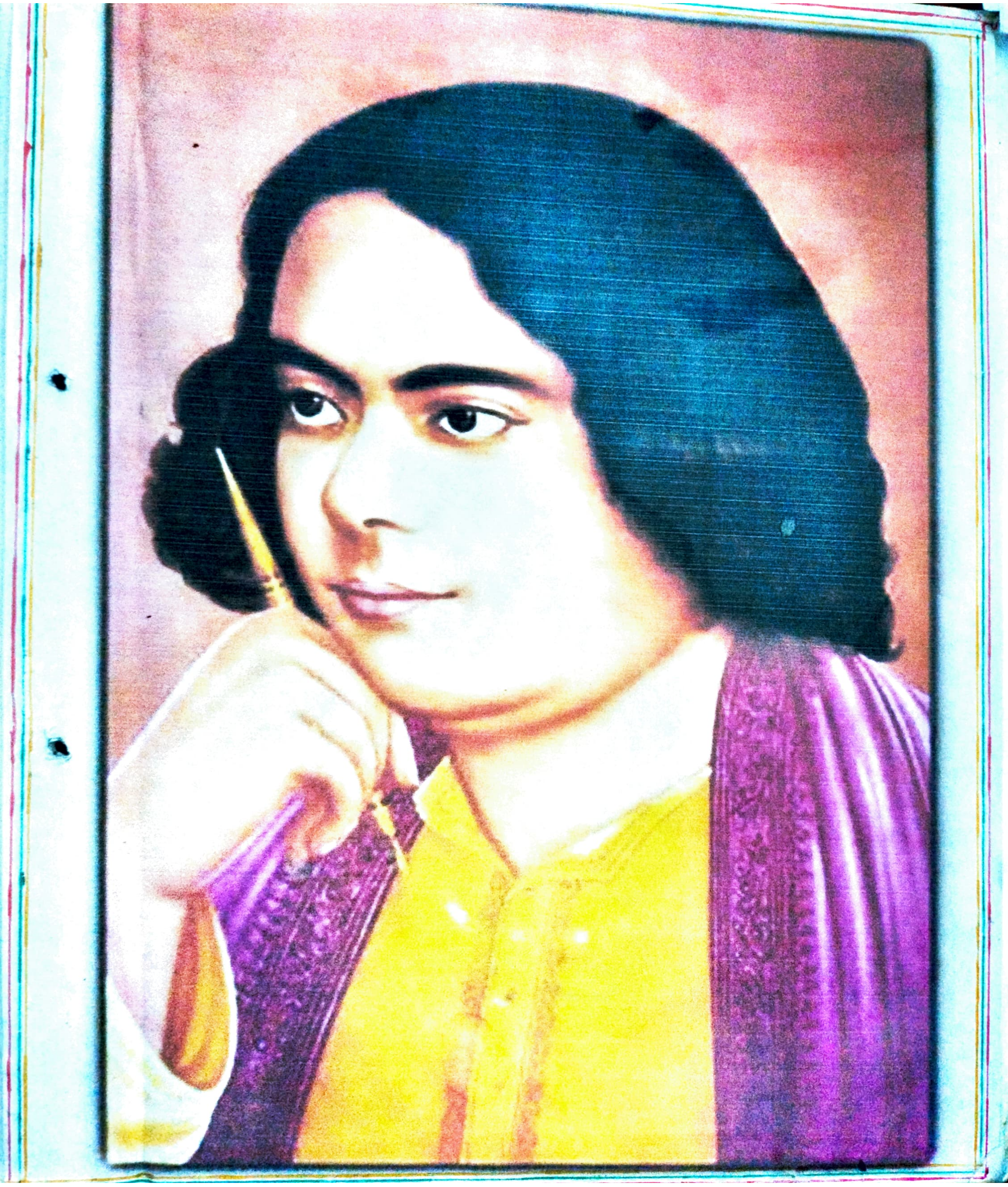

RANIGANJ GIRLS' COLLEGE

NAZRUL SANGEET

Course Name : **Dissertation related to Kazi Nazrul Islam**

Course Code : **BPAHNZSDSE602**

Topic of the Project : **কাজী নজরুল ইসলাম শুধুই বিদ্রোহী কবি নয়**

Student Name : **BEAUTY BANERJEE**

CERTIFICATE

This is to certify that this project titled .....কাজী নজরুল ইসলাম.....
.....শুধুই বিদ্রোহী কবি নয়..... submitted by the student whose name is mentioned below is a bonafide record of work carried out under my guidance and supervision.

Name of the Student	Registration No.
BEAUTY BANERJEE	KNU1911300112

25.05.2022

Dept: Music
SACT, Raniganj Girls' College
Signature of the Supervisor

with designation and department

Place: Raniganj Girls' College

Date : 25.05.2022

কাজী নজরুল ইসলাম শুধুই বিদ্রোহী কবি নয়

SUBJECT : NAZRUL SANGEET

PAPER " DSC-4

PROJECT UNDER THE SUPERVISION OF

SANTIMAY MANDAL

SUBMITTED BY:

BEAUTY BANERJEE

DEPARTMENT OF NAZRUL SANGEET

B.P.A (H) 3RD YEAR - 6TH SEMESTER

ROLL NO.: 113190612702800l

REGISTRATION NO.: KNU19113001112

RANIGANJ GIRLS COLLEGE

KAZI NAZRUL UNIVERSITY

Expt. No.
Page No.
Date.

কবির শৈশব, শিক্ষাপ্রদান ও কর্মজীবন

বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে মে, ১৮৯৯) মঙ্গলবার নজরুলের জন্ম হয়, তাঁর পিতার নাম কাজী ফকীর আহমদ পিতামহের নাম কাজী আমিনুল্লাহ, মায়ের নাম জাহেদা খাতুন এবং মাতামহের নাম মুন্সী তোফায়েল আলী

নজরুলেরা ছিলেন তিন ভাই এবং এক বোন, প্রথম কাজী সাহেবজান, দ্বিতীয় নজরুল, তৃতীয় উম্মে কুলসুম এবং চতুর্থ কাজী আলী হোসেন, বিহার প্রদেশের পাটনার অন্তর্গত হাজীপুরে ছিল নজরুলের পূর্ব পুরুষের বাসস্থান এবং সম্রাট শাহ আলমের সময়েই তারা এই স্থান পরিত্যাগ করে পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলায় চুরুলিয়াতে বসতি স্থাপন করেন, জন্মের পর থেকেই যতই দুখুমিয়া (কবির ছেলেবেলার নাম) বড় হয়েছেন ততই তার পিছু আঁকড়ে ধরেছে কঠিন দারিদ্রতা, মাত্র ৯ মাস ২৭ দিনে বাবার মৃত্যু তাকে আরো অসহায় করে তোলে, তখন তার বয়স ছিল ৮(আট) বছর (৭ই চৈত্র, ১৩১৪) এরপর এই দারিদ্র আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করল, এই কারণে শৈশব থেকে নজরুল সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া করবার সুযোগ পাননি, তবে বাল্যকাল থেকেই তার বুদ্ধিপ্রিয়তা ও মেধার পরিচয় পাওয়া যায়, গ্রামের মক্তবের মৌলবী কাজী ফজলে আহমদের কাছে তার আরবী ও ফারসী শিক্ষার হাতেখড়ি হয়, ১৩১৬ সালে দশ বছর বয়সে তিনি গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করলেন, এই কিশোর বয়সে সংসারের দায়-দায়িত্ব কাঁধে পড়ায় তিনি ঐ মক্তবে এক বছর শিক্ষকতা এবং মোল্লা গিরি করে সংসার চালালেন। লক্ষনীয় যে এই সময় থেকেই তার মধ্যে ধর্মভাবের উদ্দীপনা দেখা যায়, এবং ঋষি-সন্ন্যাসী, বাউল, সুফী, দরবেশ ইত্যাদির সঙ্গ করা ছাড়াও তিনি পুরাণ, কোরআন, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদিও মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করতেন,

OXFORD
Teacher's Signature

তাছাড়া জানা যায় যে এই সময় থেকেই ঈশ্বরের দর্শন লাভের জন্য তার মধ্যে জন্মেছিল এক সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা, যার জন্য তিনি ঝুঁকেছিলেন কঠোর উপবাস এবং নামাজের দিকে, এইসব কারণে প্রতিবেশীরা তার 'নজর আলি', 'তারাক্ষ্যাপা' ইত্যাদি নামকরণ করেছিলেন।

কিশোর বয়সেই নজরুলের মধ্যে কবিত্ব শক্তিরও স্ফুরণ দেখা যায় এবং এই বিষয়ে তার হাতে খড়ি হয় পিতৃব্য কাজী ফজলে করিমের কাছে, এগারো বারো বছর বয়সে তিনি লেটো দলে যোগ দিলেন, লেটো গানের নিয়ম হচ্ছে এই যে, একদল গান, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে অপর দলকে 'চাপান' অর্থাৎ প্রশ্ন করে এবং বিপক্ষে দল তার জবাব দিয়ে আবার পাল্টা প্রশ্ন করে, এই লেটো দলের জন্য সংগীত রচনা, সুর সংযোজনা, নাট্য পরিচালনা ইত্যাদি সব কাজ নজরুলকেই করতে হত, এই কাজে শীঘ্রই তিনি সুনাম অর্জন করলেন এবং সর্বসাধারণের কাছে কবি বলে স্বীকৃতি পেলেন, এই কৃতিত্বের জন্য নিমশাহ গ্রামের লেটো দলের ওস্তাদের পদটিও তার করায়ত্ত হল, মাত্র তিন-চার বছর তিনি সেই পদে ছিলেন, কিন্ত তারপর পড়াশোনাকে পেছনে ফেলে সরাসরি ভাবে শুরু করেন কর্মজীবন, তখন বয়স কত হয়তো ১২-১৩ তখন ১৩১৭ বঙ্গাব্দে শুধু কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে বেরিয়ে গেলেন আসানসোলে – হাজি মহাম্মদ আহাদবক্সের পাউরুটির দোকানে কাজ, মাসিক বেতন, আহার ও আশ্রয় নিয়ে ৫ টাকা, অবসর-সময়ে কবিতা লিখে এবং সংগীত-চর্চা করে কাটাতেন, লেটো দলে থাকবার সময়ে কণ্ঠ সংগীতে ছাড়াও তবলা, হারমোনিয়াম, বাঁশী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, নজরুলের গানে আকৃষ্ট হয়ে এবং তার মধ্যে সুপ্ত প্রতিভার উজ্জ্বল্য দেখে আসানসোলের

তৎকালীন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর রফিজউদ্দিন সাহেব তাঁর স্বদেশে ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার অন্তর্গত কাজীর সিমলা গ্রামের দরিরামপুর হাইস্কুলে ১৩২০ সালে সপ্তম শ্রেণীতে তাকে ভর্তি করে দিলেন, কিন্তু অধিকাংশ দিনই নজরুল স্কুলে যেতেন না সারাটা দুপুর মাছ ধরা, গ্রামবাসীদের ফসল নষ্ট করা, ইত্যাদি নানা দুষ্টুমি করে বেড়াতেন, ফলে যা হবার তাই হল, অর্থাৎ বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি প্রমোশন পেলেন না, এরপর তিনি ১৩২১ সালে রানীগঞ্জের শিয়ারশোলের রাজ স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন, এবং তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন বলে শিয়ারশোলের রাজকোষ থেকে সাত টাকা বৃত্তি, বিনা মাইনেতে স্কুলে পড়া এবং নিজখরচায় তার হোস্টেলে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন, এই সময়েই বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, দশম শ্রেণীতে প্রি-টেস্ট পরীক্ষার সময় বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা, এদিকে সাংসারিক অভাব-অনটনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে নজরুল আর কাল-বিলম্ব না করে ১৯১৭ সালে ৪৯নং বেঙ্গলী রেজিমেন্টে যোগ দিয়ে করাচী চলে গেলেন।

১৯১৯ সাল পর্যন্ত তিনি করাচীতে সৈনিক-জীবন যাপন করেন এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি হাবিলদার পদে উন্নীত হন, সেনা নিবাসেও তাঁর অদম্য জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করবার জন্য তিনি অবসর সময়ে পড়াশোনা নিয়েই থাকতেন।

তবে, একথা বলে রাখা প্রয়োজন যে কবি সাহিত্যে হাতেখড়ি হয় লেটোর দলেই, কারণ এইখান থেকেই তিনি পাশাপাশি জোর পান-জ্ঞান, সুর রচনা অভিনয় ও সাথে লেটোর শ্লোক, এভাবেই কবির জীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রতি পদে পদে উঠে এসেছে বিদ্রোহের মনোভাব, জেগেছে লড়াই করার প্রবণতা।

স্বাধীনতা আন্দোলনে কবির অবদান

বেনিয়া ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির রাহু গ্রাস থেকে দেশমাতাকে মুক্তি করার জন্য কবিও হাতে তুলে নিয়েছিলেন রাইফেল, নিজে পরেছিলেন সিপাই-এর পোশাক পরে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন করতে খেটেছেন জেল, বেঁধেছেন গান সুর করে তিনিই গেয়েছেন - নানা গ্রাম, শহরে উদ্দীপিত করেছেন দেশের তরুণ জোয়ানদের, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রতি ছিল কবির আন্তরিক সহানুভূতি, তিনি তার অমর অবদান অগ্নিবীণা কে উৎসর্গ করেছিলেন বিপ্লবী যুগের আদি পুরোহিত শ্রীযুক্ত বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে।

আহারা কবি দেশের এই চরম মুহূর্তে তরুণ ও যুব সমাজকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য কাতর কণ্ঠে আবেদন করেছিলেন এবং সে আহ্বানে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী তাদের তাজা প্রাণ দেশ মাতার মুক্তির জন্য অকপটে দান করেছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২১ সালে যখন প্রিন্স-অফ-ওয়েলস্ একবার ভারত ভ্রমণে আসেন তখন জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে দেশবাসী হরতাল ও বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বের করেছিলেন, সেই সময় কবি নজরুল নায়কের ভূমিকা নিয়ে কাঁধে হারমোনিয়াম বেঁধে সারা কুমিল্লায় নিজে গান গেয়ে বেরিয়েছিলেন যার সাক্ষী ছিল সেদিনের হাজার হাজার তরুণ ছাত্রছাত্রী, আসলে কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন একাধারে স্বাধীনতা আন্দোলনের কবি তাই তিনি বার বার দেশের লাঞ্ছিত অত্যাচারিত হতভাগ্যদের ওইসব ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার জন্য ডাক দিয়ে বললেন —

"জাগো জাগো অনশন বন্দী, ওঠোরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!

Teacher's Signature ....

দেশের যুব সম্প্রদায়কে উজ্জীবিত করার জন্য তিনি বারবার আহ্বান করে লিখেছেন — চল চল চল,

'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল রে চল রে চল,'

লিখেছেন দেশের বন্দির মুক্তমনদের উদ্দেশ্য —

"কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট,
রক্ত-জমাট শিকল পূজার পাষাণ-বেদী",

তারপর ১৯২২ সালে ওই জানুয়ারী সাপ্তাহিক বিজলি পত্রিকায় তাঁর বিখ্যাত কবিতা বিদ্রোহী। এই কবিতা থেকেই তার সুখ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে, দেশের তরুণ সমাজ ও বিপ্লবীরা পায় নানা ভাবে অনুপ্রেরণা - এই স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের এক বিরাট অংশের মিলন ছিল, তাই দেশের বৃহত্তম আন্দোলনের হিন্দু মুসলমানের মধুর চিত্র তিনি কবিতার মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন,

হিন্দিবোনা মোরা, মাতা কন্যা মাঝে
মাতা তব বীর সজ্জা হে
ওই পুণ্যলগ্নই করিবে মোদের
তিরিশ কোটি ভ্রাতৃ অর্ঘ্য হে —

কাজী নজরুল ইসলাম ধূমকেতুর ন্যায় অগ্নির ছিটে বিপ্লব আর বিপ্লবীদের বাণী সারা দেশে প্রচার করেছেন এক সুদীর্ঘ সময় ধরে। যে অসহযোগ আন্দোলনকে যে কারণেই হোক বিপ্লবীদের মনকে সেভাবে নাড়া দিতে পারেনি,

Teacher's Signature ....

কিন্তু কবি নানা রকম সাহিত্যের ছন্দে ও বানীতে এ আন্দোলনকে জয়যুক্ত করেছিলেন আর তাই তিনি দেশের বিপ্লবীদের আহ্বান করে লিখেছিলেন —

"ওই ভোই মুক্তি সেবক দল
তোদের কোন ভায়ের আজ বিদায় -
মায়ায় নয়ন ছল-ছল",

তবে নজরুলের সাহিত্যে দুনিয়ার সকল বঞ্চিত ব্যথিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে আপসহীন সংগ্রামে ছিলে সক্রিয়, স্বাধীনতা বা মুক্তি প্রতিটি মানুষের অধিকার সমন্বিত নজরুল লড়াই করেন সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সার্থক প্রচেষ্টায়, আর তা বস্তুর সমগ্র সরল ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে উদ্ভাসিত, ধনবাদী শাসন শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে তার মসি ছিল অসির চেয়েও শানালো, নজরুল নিঃস্বার্থ সাম্যবাদের আলো জ্বালিয়ে জগতে আনতে চেয়েছিলেন আলোকিত জ্ঞানবান সাম্যবাদী মানুষ যার লড়াই হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে এবং সর্বোপরি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যেখানে মানুষের জ্ঞানালোকিত স্বাধীনতা থাকবে অবাধ ও পক্ষপাত বিবর্জিত, নজরুলের সাম্যে ধর্ম-বর্ণ শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থায় সব মানুষ সমান, যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য নেই, যেখানে ধর্মের ব্যবধান নেই, কোনো বিভেদ নেই বর্ণের, ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় অবধি যে মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল বাংলাদেশে তাতে নজরুলের এইরূপ যাবতীয় দেশাত্মবোধক গানগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের জুগিয়েছিল অনুপ্রেরণা,

আর আজকের এই ধর্মের হানাহানির সময়েও দেশের মানুষের কাছে কবির এত কদর, এতো সম্মান আমাদের কাছে, কারণ কবি নজরুল ইসলাম শুধু বিদ্রোহী কবি ছিলেন না তিনি ছিলেন-মানুষের কবি, মানবতার কবি, স্বাধীন চেতনার সাম্যবাদের কবি,

Expt. No.

Page No.
Date.

কবির সঙ্গীত ও সাহিত্য চর্চা

কবিতা, নাটক, গল্প, গান, উপন্যাসের মতো সঙ্গীত ও সুরেও ছিলেন কবি সিদ্ধহস্ত, তার সম্বন্ধে বিখ্যাত গায়ক আব্দুল আহাদ লিখেছেন- "বৃষ্টিধারার মতো গান লিখে চলেছেন গ্রামোফোন কোম্পানির ফরমাস অনুযায়ী"।

তিনি তার জীবনের একাংশ সুধি গানের মধ্যে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন, তাই গানের ক্ষেত্রেও নজরুল সাহেব অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার বুদ্ধিদীপ্ত থেকে বেরিয়েছে একের পর এক গানের সুরের ঝংকার, যেমন একদিকে তিনি লিখেছেন লেটোগান, পল্লীগীতি, যাত্রাগান, মারফতী গান তেমনি আবার অন্যধারে লিখেছেন গজল, জাতীয় সঙ্গীত, কীর্তন, ভজন, শ্যামাসঙ্গীত, খেয়াল, ঠুমরী, ধ্রুপদ, ভাটিয়ালি, ঝুমুর টপ্পার মতো নানা রাগ রাগিনীতে তিনি দিয়েছেন অপূর্ব বাণীমূর্তি। একমাত্র কবি বাংলা সঙ্গীত সাহিত্যে আমদানি করেছেন বহু নতুনত্ব, সৈনিকের মার্চের সুরে গান রচনার সৃষ্টিকর্তা একমাত্র তিনি, বাংলা সঙ্গীতের ফারসী গজলের প্রকৃতি ধরে সুর দান কবির একটা অভিনব অবদান, আমাদের জেনে রাখা দরকার যে কবি নজরুলই একমাত্র কবি যিনি বাংলা ভাষায় গজল রচনা করেছিলেন, এবং তিনি বাংলা ফারসী গজল গানেরও সৃষ্টিকর্তা।

গান রচনার ক্ষেত্রে কবির প্রতিভা সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে প্রণয়ের তালে তালে। তারই কথার সাথে সুর, তাল ও লয় একত্রিত ভাবে এমন এক সঙ্গীত রচনার ভঙ্গি আর কারুর মধ্যে দেখা যায়নি, তিনি বহু অনুষ্ঠানে বারবার বলেছেন "যে আমি কাব্য ও সাহিত্যে কি দিয়েছি জানিনা, কিন্তু সঙ্গীতে যা দিয়েছি সে সম্বন্ধে আজ কোনো আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, হবে ইতিহাস লেখা আমার কথা সবাই স্মরণ করবে এ বিশ্বাস আমার আছে"।

OXFORD

Teacher's Signature ....

কবির সঙ্গীত সম্পর্কে কবি সেলেমর কালিমসে রায় মন্তব্য করেছেন যে— "কাজী ছিল আমাদের মুসলিমদের তানসেন", আর পশুপতি রায় চৌধুরি লিখেছেন যে তিনি (নজরুল) সঙ্গীতকে সঙ্গীত হিসেবেই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন,

সারাজীবনে কবি প্রায় ৪০০০-এর বেশি গান রচনা করেছিলেন, তার অসংখ্য ছিল তার রেকর্ডের সংখ্যা, তিনি নজরুল গীতিকা, বুলবুল (১, ২ খন্ড) গীতি শতদল, গানের মালা, বনগীতি, রাঙাজবা, সুরমুকুর, স্বরলিপি, সুরসাকী, চোখের চাতক, ফুলবাগিচা প্রভৃতি সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করেন, আর ছোটদের জন্য রচনা করেছেন তিনি বহু লেটো গান, যাত্রাগান প্রভৃতি, তাইতো কবি একদিন প্রচন্ড মনের আত্মবিশ্বাসে বলেছিলেন গানে আমি কিছু দিতে পেরেছি,

১৯২১ সালে ডিসেম্বর মাসে কুমিল্লা থেকে কলকাতা ফেরার পথে নজরুল দুটি বৈপ্লবিক সাহিত্যকর্মের জন্ম দেন, এই দুটি হচ্ছে বিদ্রোহী কবিতা ও ভাঙ্গার গান সঙ্গীত, এগুলো বাংলা কবিতা ও গানের ধারাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল, বিদ্রোহী কবিতার জন্য নজরুল সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন, ১৯২২ সালে তার বিখ্যাত কবিতা-সংকলন অগ্নিবীনা প্রকাশিত হয়, এই কাব্য গ্রন্থ বাংলা কবিতায় একটি নতুনত্ব সৃষ্টিতে সমর্থ হয়, এর মাধ্যমেই বাংলা কাব্যের জগতে পালাবদল ঘটে, এই কাব্য গ্রন্থের সবচেয়ে সাড়া জাগানো কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে "প্রলয়োল্লাস, আগমনী, ধূমকেতুর তরনী, শাত-ইল-আরব, বিদ্রোহী, কামাল পাশা" ইত্যাদি, এগুলো বাংলা কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল,

লোকসঙ্গীত সরাসরোপে
কবি নজরুল

Page No.
Date.

লোকসঙ্গীত হল গ্রামবাংলা বা গ্রামীন জনমানুষের হৃদয় উদ্বেল করা স্বতঃস্ফূর্ত সুরগীতি, যা স্থান কাল ও সামাজিক লোকাচার ভিত্তিক, প্রকৃতির মায়া ঘেরা অনাবিল সৌন্দর্য্যের দ্যোতক, এই গ্রাম্য সঙ্গীত স্বাভাবিক কারনে যে কোন মানুষের কাছে বিশেষ আকর্ষনীয়, সৌন্দর্য্যের অগ্রদূত কবি সাহিত্যিকদের প্রানকেন্দ্রভূমি এই গ্রাম বাংলা, কবি নজরুল নানা সময়ের এবং নানান কারণে বাংলার বহু জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছেন, পূর্ববঙ্গে থাকাকালীন নদী মাতৃক পূর্ববঙ্গের সুশীতল ছায়াঘেরা প্রান্তর ও মাঝি-মল্লার সনে একান্ত হয়ে গিয়ে পল্লীসুরের আধারে বহু গান সৃষ্টি করেছিন,

কবির জন্মভূমি পুরুলিয়া সাঁওতাল পরগনা থেকে বিশেষ দূরে না থাকার জন্য সাঁওতালী গীতছন্দের মধুর গান নজরুল গীতিতে একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে,

বিশেষ করে ভাটিয়ালী সুরের গান তাঁর এক অপূর্ব সৃষ্টি, তাছাড়া তাঁর সৃষ্ট বাউল, ভাওয়াইয়া, কাজরী ইত্যাদি গান মাটির সোঁদা গন্ধ ও গ্রাম্য জীবনের ঘ্রানে ভরপুর,

তার কয়েকটি লোকগীতি —

১) আমি বাউল হলাম ধূলির পথে লয়ে তোমার নাম,
২) ও কালো বউ জল আনিতে যেও না, ৩) পদ্মার ঢেউরে,
৪) রাঙা মাটির পথে লো, মাদল বাজে
৫) নদীর নাটিতে কেশে গো নাই যদি আর ফিরি
৬) গেরুয়া রঙ মেঠো পথে বাঁশরি বাজিয়ে কে যায়

যার লেখনিতে, সুরে, লোকগানে প্রকৃতির টান, ভালোবাসা ঝরে পড়ছে তাঁকে কি করে আমরা শুধুমাত্র বিদ্রোহী কবির আখ্যায় বেঁধেছি —

Teacher's Signature ....

Page No.
Date:

নজরুল সৃষ্টি
-ভক্তিগীতি-

পিতার সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, সহনশীলতা এবং সর্বোপরি সর্বধর্মের মর্মবাণী সূত্রে নজরুল জীবনে যথাযথ প্রতিফলনের জন্য তাঁর জীবন চিন্তায়, কাব্য ও সঙ্গীতে সর্বধর্মের মূল অন্তর্নিহিত স্বরূপ প্রকাশের দ্বারা এক অনিবার্যনীয় ভক্তিগীতির জন্ম হয়েছে, যা ইতিপূর্বে বা পরে আর কোন কবির মধ্যে এত বিস্তৃত প্রকাশ ঘটেনি। নজরুল গীতিতে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সাধকের মর্মবাণী একই স্রোতে প্রবাহিত হয়ে যে একাত্মতার পরিচয় দিয়েছে তা অবিস্মরণীয়, সেই কারণে নজরুলকে সর্বধর্মের সমন্বয়কারী কবিরূপে গণ্য করা যায়, তাঁর দৃষ্টিতে ও অনুভবে আল্লা, কালী একই রূপ পরিগ্রহ করে মনলোকে অধিষ্ঠিত। নজরুল জীবন সমীক্ষায় জানা যায় যে, শৈশব অবস্থা থেকেই তিনি বিশেষ ধর্মপ্রাণ ছিলেন। কবির জন্মস্থান চুরুলিয়াতে সুফী ও বাউলদের বিশেষ সমাগম হত। নজরুলের তাঁদের সান্নিধ্যে যাওয়ার অবকাশ ঘটে, তিনি বিভিন্ন ধর্মালোচনায় যোগ দিতেন। রামায়ণ, মহাভারত এবং কোরানের মূল বক্তব্য তাঁর জীবন ও কর্মে প্রকাশিত হয়ে এক মরমীয়ার পদে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে।

নজরুল সৃষ্টিকে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, ত্রিশ দশকের শুরু থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যেই এই ভক্তিগীতি গুলির জন্ম হয়, কবি জীবনের বাস্তব প্রতিফলন এই ভক্তিগীতি। কবির প্রাণাধিক পুত্র বুলবুলের অকাল মৃত্যু এবং পত্নী প্রমীলাদেবীর পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে যে চরম অন্তর্দাহ কবিমনকে ব্যথিত করেছিল, তারই ফলে কবিমনে ভক্তি চিন্তার জন্ম নেয়, সেই সময় তিনি ঘটনাচক্রে হঠযোগী বরদাচরণের সান্নিধ্যে আসেন, ও তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন,

বস্তুত:— তখন থেকেই কবি নজরুলের ভক্তিগীতির জন্ম হয়, কবি সারাদিন কালীমূর্তির সম্মুখে যোগ সাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন, কবির অনেক ভক্তিগীতির জন্ম হয় এবং বৈষ্ণব, শাক্ত, ও ইসলামী ধর্মের ভিত্তিতে গান সৃষ্টি করেন।

Teacher's Signature ....

Page No.
Date.

দুঃখশেরা জীবন বৃন্তের সুরক্ষ ও অসুর-বীনা তন্ত্রের, আত্মনিবেদিত সমর্পনের অর্চনায় অনুরনিত তাঁর এই ভক্তিগীতিগুলি যে কোন সাধক প্রান অথবা অন্তরের চিন্তার সমতুল্য।

অনুবিধান করলে দেখা যায় যে শেষজীবনে সাম্যবাদী, সাম্যবাদী কবির সুরবিদ্র লেখনী আজি থেকে বাঁশীতে রূপান্তরিত হয়ে যে অভাবিত ভক্তিরসের জোয়ার এনেছিল যা ভক্ত রামপ্রসাদের পরে আর কোন ভক্তের দ্বারা সম্ভব হয়নি বলে বিশ্বাস, নজরুল রচিত কতকগুলি শ্যামা সঙ্গীত যেমন:—

১) শ্যামা নামের ভেলায় চড়ে, (২) আয় মা চঞ্চলা মুক্তকেশী শ্যামা কালী, (৩) শ্মশানে জাগিছে শ্যামা মা, (৪) বল রে জবা বল, (৫) মা তোর চরন কমল দিয়ে, (৬) ঘির হয়ে তুই বস দেখি মা প্রভৃতি।

ইসলাম ধর্ম ও ইসলামীক গান :—

নজরুল শিশু বয়স থেকে ধর্ম বিষয়ে পিতার ন্যায় উদার ছিলেন, তিনি মাত্র দশ বছর বয়সে সুফী ফকিরের নির্দেশে মরহুমীয় বাড়ের সবিন এবং সুফী হজী পালোয়ানের কবরস্থানে ঈশ্বর উপাসনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন, যেখানেই কোরানের ব্যাখ্যা হত—সেখানেই নজরুল হাজির হতেন, তার ভক্তিগীতি গুলি ভক্তমনের ভক্তি রসেরই প্রবাল পরিচায়ক, কবি ইসলামী আপনও অনুভূতিকে প্রানের গভীর সত্যে উদ্ভাসিত করে প্রানের আকুতিকে সহজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন, কখনো তিনি আল্লাকে রুদ্ররূপে কখনো করুনাময়ীরূপে অঙ্কিত করাইন, কবির কয়েকটি ইসলামীগান হল:—(১) আল্লা রসুল জপের ধ্বনে, (২) ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে, (৩) ওরে ও নতুন ঈদের চাঁদ (৪) আল্লা নামে নায় চড়ে যাবো, (৫) ডাকে ডাকে পুনঃ অলিয়া উঠিছে। প্রভৃতি—

Teacher's Signature ....

নজরুলের গজল

গজল মূলত পারস্য দেশের গান, গজল গানের মূল উপজীব্য হচ্ছে প্রেম, তাই গজল গানকে প্রেমসঙ্গীত ও বলা চলে, তবে এ প্রেমসঙ্গীত প্রণয়ী, অতীন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ময়তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার মধ্যেই নিহিত থাকে শ্রেষ্ঠ পারস্য গজলের যথার্থ রসাস্বাদ, "শ্রেষ্ঠ পারস্য গজল শ্রেষ্ঠ ভাবসংগীত"

বাংলা গানের ধারায় প্রথম গজল আমদানী করবার কৃতিত্ব অতুল প্রসাদের, কবি মোহিতলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কয়েকটি সার্থক গজল রচনা করেছিলেন, তবে এঁরা পূর্বসূরী হলেও বাংলা গজল রচনায় কৃতিত্বের অধিকারী নজরুলই শ্রেষ্ঠত্বের আসনদাবী করতে পারেন, এর কারণ গজলের মধ্যে প্রেমের যে লঘুভঙ্গীটি নিরন্তর অঙ্কুরণশীল তাকেই কবি বাংলা কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন, অর্থাৎ এক দিকে ক্লিষ্ট পারসিক গজলের সুরে গানের মধ্যে প্রায়শই দীর্ঘায়িত করার প্রবণতা, যাকে পরিভাষায় বলা হয়ে থাকে 'শায়ের' তারই মাধ্যমে পরবর্তী স্তরে দ্রুত তালের সংযোজন নজরুলের বাংলা গজলকে বিচিত্রতর রূপে পূর্ণ করে তুলেছে, অপরদিকে তেমনই বিষয়মিশ্রিত গজলগুলিতে মানবিক আবেগের গভীরতা তার গজলকে এনে দিয়েছে বিদেশী মাধুর্যের বিস্ময়ের এক প্রতীকতা

এই গভীরতা বাংলা গানে বিরল, হালকা চালে আরবী ফারসী শব্দের মিশ্রিত অথচ অত্যন্ত সুন্দর ব্যবহারই হল নজরুলের গজলগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য নজরুলের গজলকে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন:—

১) পারস্য গজলের বিষয় বা প্রতিধ্বনিসুলভ রচনা অনুবাদ কয়েকটি উদাহরণ—

১) মূল- বাগিচায় বুলবুলি আমি
রঙিন প্রেমের গাই গজল।

২) চাহিদা মদ আঙুর পেশায়
আজল যখন ফুলের ফসল
মূল- বাগে ফুল চায় বিদায়, ইত্যাদি

Page No.
Date.

২) পারস্য গজলের সুর অর্ধ-সুরচিত গজল, যেমন : —

১) কিরণের ফুলবাগে মোর ফুল করে
আজ ফুটলো কি মুকুল

২) বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে
দিসনে আজি দোল,

৩) এল ফুলের মরসুম
আরব চালো আজী ইত্যাদি ....

৩) পারস্য গজলের প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ বাংলা গজল, যেমন: —

১) মোরা ফিরে মোছরে আঁখিজল
ফিরে চল আপনারে নিয়া

২) এ আঁখিজল মোছ পিয়া
ভোলো ভোলো আমারে

৩) কে বিদেশী মন উদাসী
বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে, ইত্যাদি....

নজরুলের বাংলা গজলগুলি যে উৎকৃষ্ট কাব্যগীতি তাতে সন্দেহ নেই, নজরুলের গজল গানের বিশেষত্ব হচ্ছে বাংলা, উর্দু আরবি শব্দের অভিমিশ্রণ, তিনি শুধু গজল গানের কারণেই নেননি আবার গজল গানের সুর প্রভাবিত বাংলা গজল গানও লেখেন, দুই তিনটি ভাষার অভিমিশ্রণ সৃষ্টি তার একটি অনন্য নজির, কবি প্রথম গজল গানে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এক হিন্দি প্রেমী ভিখারির গানের অনুকরণে তিনি লিখেছিলেন — "নিশী ভোর হল জাগিয়া", এখান থেকেই তার গজল গানের যাত্রা শুরু, গজল গান, অর্থাৎ বাংলায় বলা হয় নিখাদ প্রেমের গান, যারা কবিকে বিদ্রোহী কবি বা বিদ্রোহী গানের আখ্যা দিয়েছেন, ইচ্ছাকৃত ভাবে কবির অলৌকিক প্রতিভাকে চাপা দেওয়ার জন্য, সেখান থেকে কবি তার সক্রিয়তা আর প্রতিভার জোরে তিনি নিজেকে উন্মুক্ত করেছেন,

Teacher's Signature ....

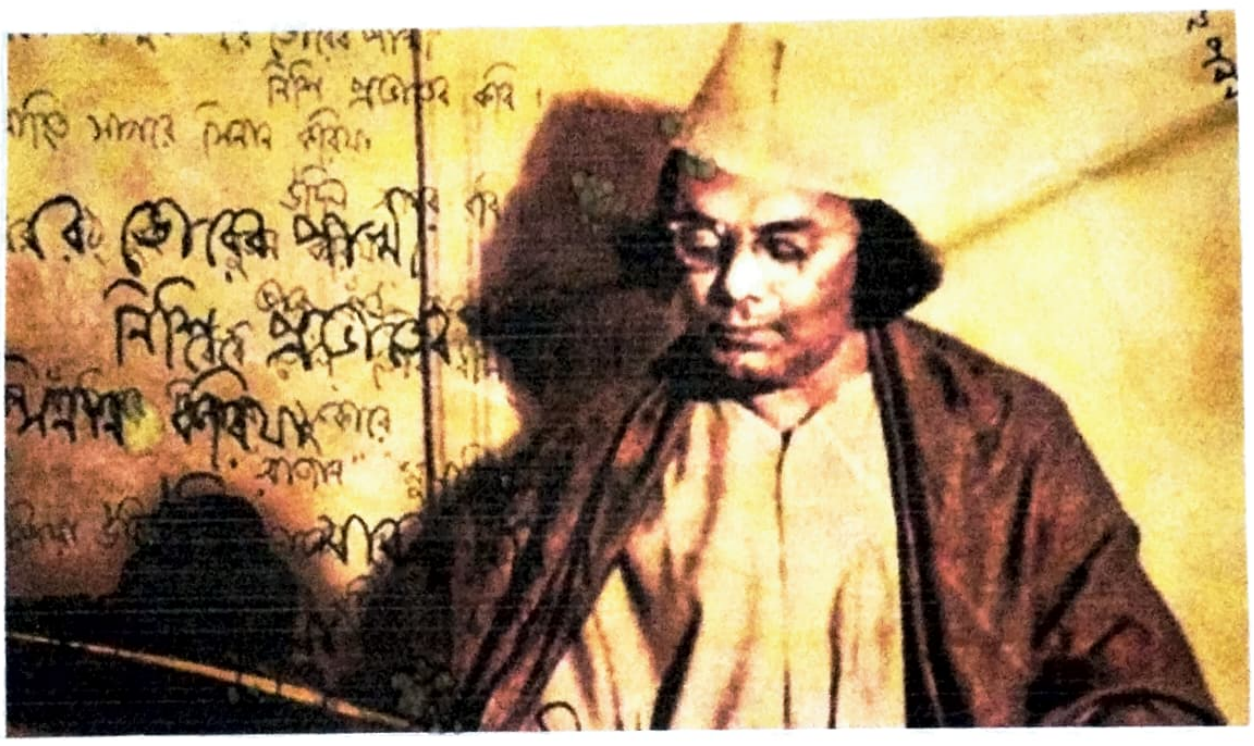

নজরুলের ধর্মনিরপেক্ষতা ও "শ্যামা সঙ্গীত"

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার সময়ের সবচেয়ে আলোচিত কবি ছিলেন, সমাজের নিপীড়িত মানুষকে প্রতিবাদী করে তোলার মত ক্ষমতা একমাত্র নজরুলেরই ছিল, সে সময় ভারতীয় অঞ্চলে নজরুল ব্যতীত অন্য কোনো সাহিত্যিকের সাহিত্য মানুষকে এত আন্দোলিত করতে পারেনি, রবীন্দ্র সাহিত্যও সময় নজরুলের মত এত প্রতিবাদী ছিল না, উত্তাল ভারতবর্ষে নজরুলের 'বিদ্রোহী' বা 'আনন্দময়ীর আগমনে' অথবা 'ধূমকেতু' কবিতা ব্রিটিশ শাসনের পাকা ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল, যা অন্য কোনো কবি-লেখকের দ্বারা সম্ভব হয়নি।

নজরুল এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন হিন্দু-মুসলিম বিভাজিত সে সময়কার ভারতীয় সমাজে নজরুল বিষয়ে সকল মহলে শুরু হয় বিস্তারিত আলোচনা, তবে আলোচনা শুধু আলোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল না, সমালোচনাও ছিল ব্যাপক। মুসলিম হওয়ার কারণে হিন্দুদের একটা শ্রেণির মানুষ নজরুলকে বিজাতি মনে করত, ঠিক একইভাবে একশ্রেণির মুসলমান নজরুলকে বিজাতি ঘোষণা করেছিল, কারণ ছিল হিন্দু ধর্মের প্রতি নজরুলের অতি আগ্রহ, নজরুলের 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতা পড়লে সহজেই বোঝা যায়, ওই সমাজের মুসলিমদের একটি শ্রেণী নজরুলকে কাফির আখ্যা দিতে দ্বিধা করেনি, নজরুল 'আমার কৈফিয়ৎ' এ লিখেছিলেন —

'মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল্লারা' কন হাত নেড়ে, 'দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে'।

বাংলা সাহিত্যে আর কোনো সাহিত্যিককে নিয়ে এত সমালোচনা হয়নি কখনো, বিশেষ করে কট্টরপন্থি মুসলমানদের মাঝে নজরুল সম্পর্কে সবচেয়ে বড় অভিযোগের কারণ ছিল নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত। একটা সময়ে পূর্ববঙ্গের বেতারেও নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত সম্প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।

Page No.
Date.

তৎকালীন ভারতবর্ষের অবস্থা উত্তাল, একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর অন্যদিকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি, বিশ্বময় পুঁজিবাদী দেশগুলোর আগ্রাসন শুরু হয়েছিল, এমন উত্তাল সময়ে প্রতিবাদই ছিল নজরুলের একমাত্র ভাষা, সে সময় 'শাক্তদর্শন' ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল নজরুলকে, নজরুল কালি সাধনাও শুরু করেছিলেন, শাক্তধর্ম মানে শক্তিবাদ, হিন্দুধর্মের প্রধান তিনটি বিভাগের অন্যতম এটি। হিন্দুধর্মের একটি শাখা সম্প্রদায় ছিল এই শাক্ত অনুসারীরা, হিন্দু দিব্য মাতৃকা শক্তি বা দেবী পরম ও সর্বোচ্চ ঈশ্বর- এই মতবাদের উপর ভিত্তি করেই শাক্তধর্মের উদ্ভব, আর এই শাক্ত দর্শন থেকেই নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত রচনা শুরু।

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী মতে, দুর্গাদেবীর একটি বিশেষ রূপ হল 'কালী', এই কালীদেবীরই অন্য নাম আবার শ্যামা, শ্যামা বন্দনা বা শ্যামাদেবীরই অন্যরূপ কালী, শ্যামাদেবীর উদ্দেশ্য নিবেদিত গানগুলোকে সাধারণভাবে শ্যামাসঙ্গীত বলা হয়। শাক্তসঙ্গীত নামটিরও ব্যবহার হয় এক্ষেত্রে। শ্যামা মার পরিচয় দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন —

"আর হাতে কালি মুখে কালি,
মা আমার কালিমাখা, মুখ দেখে মা
পাড়ার লোকে হাসে খালি,

নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, আবেগের গভীরতা, কেউ কেউ মনে করেন, নজরুল হৃদয়ের গভীর থেকে শ্যামার প্রতি ভক্তি নিবেদন করেছিলেন, আর তার সে ভক্তি সাকার হয়েছিল তার গানের ভাষাতে, তিনি লিখেছেন —

" ভক্তি আমার ধূপের মত
ঊর্ধ্বে উঠে অবিরত, —

শ্যামা সঙ্গীতের ধারাটি বিকাশ লাভ করে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে, আঠারো শতকের মধ্যভাগে সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন এতে প্রাণ

Teacher's Signature

তাঁহার হাতে বাংলা গানের অন্যতম শাক্ত পদাবলি বা শ্যামা সঙ্গীত ও বাংলা একটি বিশেষ সঙ্গীত ধারা প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু বিশেষ বাঙালির শ্রেষ্ঠ শ্যামা সঙ্গীতকার হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম।

নজরুলের গানের সৃষ্টির একটি বড় অংশ হচ্ছে শ্যামা সঙ্গীত, সঙ্গীত বিষয়ক নজরুলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল 'রাঙা জবা', ১৯৬৬ সালে ১০০টি শ্যামা সঙ্গীতে সমৃদ্ধ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, শক্তি দেবতায় তাঁর ভক্তি হৃদয়ের অকৃত্রিম অনুকূলতা ও ভক্তি রাঙা-জবার গানের মধ্যে রূপায়িত।

দেবী শক্তির প্রতি নজরুলের ভক্ত হৃদয়ের অকৃত্রিম অনুকূলতা চিরকালই ছিল, তাই শুধু শ্যামা সঙ্গীতের প্রণব সঙ্গীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তার কবিতাতেও প্রকাশ পেয়েছিল, ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামে যে কবিতাটির জন্য কবি এক বছর সশ্রম কারারুদ্ধ হন, সেই কবিতাটিও ছিল শক্তিসাধনার প্রকাশ—

"আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।"

সৃষ্টিশীল চর্চার জন্য সামান্য কিছু সময় পেয়েছিলেন কবি নজরুল, কিন্তু জীবনের এই অল্প সময়েই তিনি রেখে যান বাংলার জন্য এক সুর ভান্ডার, বিভিন্ন দৃষ্টিতে শ্যামাসঙ্গীত নামক ধারা বিতর্কিত হয়-হবেও হয়তো, কিন্তু তার শ্যামাসঙ্গীতের রচনা কৌশল আর ভক্তির প্রাচুর্য্য থেকে যায় চিরদিন, যে সব উক্তিগুলির মধ্যে ছিল ধূমকেতুর ন্যায় অনুরঞ্জনা আর বিশেষত চির বিদ্রোহের বাণী, আজও ভারতবর্ষে শ্যামা সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা উঠলে সবার আগে নজরুলের সৃষ্টিগুলি স্মরণ করতে হয়, এরপরেও কি আমরা কবিকে শুধুই বিদ্রোহী কবি বলবো?

হাস্যরসে নজরুল

বাংলা সাহিত্যে প্রত্যেক কবির একটি ভাবমূর্তি দাঁড়িয়ে যায়, যেমন পল্লিকবি, যেমন বিশ্বকবি, নাগরিক কবি, আধুনিক কবি, মরমি কবি, বিপ্লবী কবি, জনমানুষের কবি ইত্যাদি, ঠিক সেইরকম কবি নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রেও একটি পদবি তৈরি হয়ে গেছে সেই ১৯২০ সাল থেকে বিদ্রোহী কবি,

অনেকের ধারণা নজরুলের জীবনে শুধুই বিদ্রোহ, শুধুই ঝড়ের তাণ্ডব, প্রকৃত প্রস্তাবে নজরুলের জীবনে যে হাস্যরস, যে আনন্দময় দিক ছিল তা উপেক্ষিত থেকেছে আলোচনায়, সেই প্রসঙ্গ আলোচনায় আলো ফেললেন লেখক তাপস রায়, 'রসিক নজরুল' শীর্ষক একটি দুর্দান্ত গ্রন্থ রচনা করে তিনি আমাদের সামনে তুলে দিলেন অপরূপ অজানা নজরুলকে,

গ্রন্থের মুখবন্ধে হায়াৎ মামুদ লিখেছেন:- 'সে গরুর না ছুঁইয়ে—' এমন এমন অদ্ভুত শিরোনামে কবিতা - ভাবা যায়, এই জন্য তাঁকে রসিক নজরুল বলা হত, নজরুল ছিলেন বাঁধন-হারা।

নজরুলের জীবনে হাস্যরস যেমন অন্যতম বেদনার চিহ্ন ও কথানম, বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত মানুষদের জীবনে হাস্যরসের নানা উপাদান আমাদের আনন্দিত করে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ ধরনের নানা হাস্যরস আমাদের জানা আছে, ঠাকুরবাড়িতে পাগলামি সংক্রান্ত অনেক ঘটনা আমাদের কৌতূহল তৈরি করে দেয়,

কবি কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি হাসির গান যেমন—
(১) আমার খোকার মাসী শ্রী অম্বুকবালা দাসী, (২) আমার হরিনামে রুচি, (৩) আমি মুলতানী গাই, (৪) বাঙালী বাবু (৫) মাছ-মিশালী পাঁচমিশালীর পাল (৬) বিছানা আছে বালিশ আছে বৌ নাই মোর ঘরে, (৭) সুঁটকি দা আমি বুড়ী, (৮) সাইমন-কমিশনের রিপোর্ট (৯) এই সর্দার খাতুনীর চেয়ে আলম ভালো, (১০) ত্যাগো হিন্দুস্থান আমের মেয়ের, রাজা আংরেজ হারাম-খোর, প্রভৃতি — — ।

Teacher's Signature ....

নজরুল গীতিতে রাগ সঙ্গীত

Page No.
Date

কবি নজরুল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বিশেষ অনুরক্ত ছিল, তিনি প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পি ওস্তাদ কাদের বক্স এবং খ্যাতনামা ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেবের নিকট বহুদিন সঙ্গীত শিক্ষা করেন. বাল্যকালের সঙ্গীত শিক্ষার হাতে খড়ি হয় তাঁর খুল্লতাতে নিকট, বাল্যকাল থেকেই নজরুলের গান রচনা ও সুরারোপের দক্ষতা ছিল অসীম, ফলে কবির কাব্যছন্দ এবং সুর প্রয়োগ বিশেষ স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর, কবির রাগাশ্রিত রাগপ্রধান গানগুলি নিজস্ব বাণী ও সুর প্রাচুর্যে প্রাণবন্ত, কবি নজরুল তাঁর সৃষ্ট অনেক গানে সুরারোপ করতে গিয়ে প্রচলিত বা অপ্রচলিত রাগ ও তথাকথিত ছন্দ বা তালের সাথে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার দরুন নিজে কয়েকটি নূতন রাগ এবং তালের সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর বিশেষ শিল্প চেতনার বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করে, গানে সুরারোপ ও ছন্দের অসুবিধার জন্য নবরাগ ও ছন্দ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা কবি নিজেই তাঁর এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন,

কয়েকটি অপ্রচলিত রাগ যেমন — দেবগান্ধার, আহীর ভৈরব, নীলাম্বরী, নারায়ণী, হিজাজ-ভৈরবী, লঙ্কাদহন সারঙ্গ, শিবরঞ্জনী, পটমঞ্জরী, শ্যাম কল্যাণ, নট-বেহাগ, সাওনী কল্যাণ ইত্যাদি,

পরিণত জীবনে নজরুল ভারতীয় সঙ্গীতে উপরিউক্ত লুপ্ত বা অর্দ্ধলুপ্ত রাগগুলি সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিত্য গানে কৃতিত্বের সঙ্গে সুর যোজনা করেছেন, এই রাগাশ্রিত গানগুলি অধিকাংশ — খেয়াল, অঙ্গ গীত হয়ে থাকে যেমন! —

" পার্থসারথি বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য তব শঙ্খ (শিবরঞ্জনী)
" স্নিগ্ধ আলো জেলে কাঁদে (মালগুঞ্জ) " এসো চিরজনমের সাথী " (নজরবলী)
" নারায়ণী উমা খেলে হেসে " (নারায়ণী) " রুম ঝুম ঝুম নূপুর বাজে " (নট বেহাগ)
" মগলের তালবনে নীরব কেন কবি " (হিজাজ ভৈরব) " সন্ধ্যা গোধূলি লগনে কে (সাওনকল্যাণ)

ইত্যাদি বহু গানে বিভিন্ন রাগ মিশ্রণের কৃতিত্বে কবি নজরুল যুগান্তকারী ভূমিকা নিয়েছেন,

Teacher's Signature ....

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কবি

কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বরাবরই কঠিন হস্তে আন্দোলন করে এসেছে কারণ তিনি মনে প্রাণে ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি, তার বলিষ্ঠ প্রমাণ পায়, যখন তিনি গোঁড়া হিন্দু পরিবারের মেয়ে প্রমিলা দেবীকে তার জীবনসঙ্গিনী করেন, এবং পরবর্তী কালে তার সন্তানদেরও নাম জাত-পাতের ঊর্ধ্বে রাখার চেষ্টা করেন।

তিনি তার লেখনির মধ্যে বহুবার হিন্দু মুসলমানদের একত্রিত করে একই "বৃন্তে দুটি কুসুম"-এর মতো একই পবিত্র বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিলেন, দেখিয়ে দিয়েছেন— উগ্র সাম্প্রদায়িকতা সমাজকে কোন পর্যায় নিয়ে যেতে পারে, কি ভয়াবহ এক কুৎসিত লড়াই-এর পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে এই সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বিষ।

কবির মতো এক দেশ খ্যাত অসাম্প্রদায়িক কবি যিনি বহু শ্যামা সঙ্গীত, ভজন কীর্তন রচনা করেছেন এবং গেয়েও ছেন, তো তাকেও একদিন এই সাম্প্রদায়িকতার হীন ও উগ্র হিন্দুবাদের শিকার হতে হয়েছিল, যেমন— ১৯২৪ সালে ১৮ই এপ্রিল ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যালের বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়ে কবি সেই বিবাহ সভায় উপস্থিত হন, কিন্তু সেই বাড়ির পরিবেশ ছিল অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দুয়ানী, ওই বিবাহ সভায় ভোজন পর্বে কবি নজরুলকে দেখে একদল গোঁড়া হিন্দু ভোজন সভা থেকে উঠে পড়েন, এই অমানবিক দৃশ্য দেখে কবি মনে মনে খুবই আঘাত প্রাপ্ত হন, আর এই অবস্থাতেই তো আমাদের মনে পড়ে কবির লেখা সেই— "জাতির নামে বজ্জাতি সব কারিকুরি, যার মূলে আসলেই ছিল ওই সাম্প্রদায়িকতা, কবির জীবনের বেশ কিছুটা সময় নানা গান, কবিতা, গল্পের মধ্যে দিয়ে এই জাত-পাতের বিকলাঙ্গ বিষয়গুলোকে সমূলে সরানোর চেষ্টা করেছেন, দীর্ঘদিনের এই অন্ধ-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটা বড়সড় আঘাত আনার জন্য প্রচেষ্টা কবি চালিয়ে গেছেন,

Teacher's Signature

Page No.
Date.

বেতার ও চলচ্চিত্রের কবির অবদান

কবির যে বহুমুখী প্রতিভার উদাহরণ আমরা পেয়েছি তার মধ্যে তিনি একাধারে ছিলেন কবি, সুরচয়িতা, গীতিগীতির স্রষ্টা তেমনি তিনি ছিলেন বেতার ও চলচ্চিত্রের প্রতি গভীর ভালোবাসার কবি, ১৯৩১ সাল থেকে বাংলা চলচ্চিত্র গানে গানে সরব হয়ে ওঠে কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত ও সুরের স্পর্শে তার প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে।

চলচ্চিত্রে তিনি অবদান রেখেছেন সুরভান্ডারি, পরিচালক সুরকার, গীতিকার, অভিনেতা, গায়ক, চিত্রনাট্যকার, সংলাপকার ও সংগঠক হিসেবে। ১৯৩১ থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত চিত্রলোকে নজরুল ছিলেন এক সক্রিয় ব্যক্তি। শুধু বাংলা চলচ্চিত্র নয়, তার দানে সমৃদ্ধ হয়েছে হিন্দি, উর্দু ও পাঞ্জাবি ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রও।

তিনি ছিলেন একজন সুগায়ক, ও বলিষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ। বেতারে তিনি গান রচনার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা করেছিলেন যার মূল অবদান ছিল সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরে তিনি নিজের সাবলীল গায়কী ভঙ্গিমায় প্রতিটি বেতার শ্রোতাদের কাছে গায়ক হিসাবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন, এবং তার মধুর কণ্ঠস্বরের জন্য সেই সময় জনপ্রিয় হিজ - মাস্টার্স ভয়েস - এ গান রেকর্ডিং করার সুযোগ পান এবং সেখান থেকে তিনি আয় করেন মাসিক একহাজার টাকা, যা দিয়ে তিনি তার সাধের মোটর গাড়ি কিনে ছিলেন।

এছাড়াও তিনি বহু বাংলা চলচ্চিত্র রচনা করেন, সাথে লিখেন গান, করেন সুর রচনা, যা সেই সময় প্রতিটি মানুষের মনে গেঁথে গিয়েছিল সেই সব গানের কথা ও সুর।

১৯৩৮ সালে তিনি রচনা করেন দুটি সিনেমা চিত্র - যার মধ্যে প্রথমটির নাম - বিদ্যাপতি ও দ্বিতীয়টি সাপুড়ে।

Teacher's Signature ....

এখানে বলে রাখা ভালো যে দুটি চলচ্চিত্রের পরিচালনা করেন সেই সময়ে প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক দেবকী বসু

এভাবে চলতে চলতে তিনি মাত্র ৩৩ বছর বয়সে নিজে অঙ্গাঙ্গি ভাবে বাংলা চলচ্চিত্রের সাথে জড়িয়ে পড়লেন, এবং প্রায় এক দশক ধরে এই শিল্পের সাথে থেকে যান,

এই চলচ্চিত্র সমাজে থাকতে থাকতে কখনো হয়েছেন গীতিকার কখনো সুরকার, কখনো অভিনেতা আবার কখনো তাকে দেখা গিয়েছে পরিচালকের ভূমিকায়, অত্যন্ত দক্ষ অভিনেতা ছিলেন তিনি, তার প্রথম আবির্ভাব হয় পায়ওনীয়ার কোম্পানির প্রথম সবাক ছবি ধ্রুবতে (১৯৩১ সালে) সেখানে তিনি নারদের চরিত্রে অতি চমৎকার অভিনয় করেন, তারপর তিনি সবাক চলচ্চিত্র জামাই ষষ্ঠীতে সুর ভান্ডারীর কাজ করেন, ম্যাডান থিয়েটার্স কোম্পানির আরও যেসব চলচ্চিত্রের সাথে নজরুল সংযুক্ত ছিলেন সেগুলো হল — 'জ্যোৎস্নার রাত' (১৯৩১) 'প্রহ্লাদ' (১৯৩১), 'ঋষির প্রেম' (১৯৩১) 'বিষ্ণুমায়া' (১৯৩২), 'চিরকুমারী' (১৯৩২) 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৯৩২) 'কলঙ্ক ভঞ্জন' (১৯৩২) 'রাধাকৃষ্ণ' (১৯৩৩) এবং 'জয়দেব' (১৯৩৩) ১৯৩১ সালে বাংলা সবাক চিত্র 'জলসায়' নজরুল নিজের একটি গান গেয়েছিলেন এবং 'নারী' কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন, তারপর এই ধ্রুব ছবিটি ১৯৩৪ সালে ১লা জানুয়ারী তখনকার বিখ্যাত টকিজ ক্রাউন টকি হাউসে মুক্তি পায়, এখানে এই ছবির প্রতিটি গান রচনা করেছেন নজরুল সাহেব, এছাড়া তিনি অভিনয় করেন ধূপছায়া চলচ্চিত্রে, যার পরিচালক ছিলেন তিনি নিজে, এরপর ১৯৩৫সালে ২৩শে মার্চ বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী নিয়ে কালি ফিল্ম-এর পাতালপুরি ছবিতে তিনি মিউজিক ডাইরেক্টরের কাজ করেন, এরপর তিনি ১৯৩৮ সালে 'পাতালপুরী' ছবির সুরারোপ ও সংগীত পরিচালনা করেন।

Teacher's Signature ....

১৯৩৭ সালে 'গ্রহের ফের' ছবির সংগীত পরিচালনা করেন, ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন নজরুল, এতে রবীন্দ্রনাথের গানে তিনি সুরারোপ করেন। সিনেমাটির পরিচালক ছিলেন নরেশ মিত্র, ১৯৩৮ সালে নির্মিত 'সাপুড়ে' ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছিলেন নজরুল।

এই ভাবে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে যেতে তিনি নানা ছবিতে সুরকারেও ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন, ১৯৪১ সালে ৮ নভেম্বর মুক্তি পায় নন্দিনী ছবিটি যার মুখ্য গীতিকার ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

এরপর ১৯৪২ সালে নির্মিত 'চৌরঙ্গী' ছবিতে নিজের লেখা ৮টি গানে সুর ও সংগীত পরিচালনা করেন নজরুল, ১৯৪৫ সালে নির্মিত 'অভিনয় নয়' ছবিতে গিরিন চক্রবর্তীর সুরে নজরুলের লেখা একটি গান ব্যবহৃত হয়, 'দিকশূল' ছবিতে পঙ্কজ মল্লিকের সুরে নজরুলের দুটি গান ব্যবহৃত হয়, 'শহর থেকে দূরে' ছবির অন্যতম গীতিকার ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, সব মিলিয়েই বাংলা চলচ্চিত্রের গোড়াপত্তনের সাথে জড়িয়ে ছিলেন তিনি,

এই অসাধারণ বহুমুখী প্রতিভার কবি যেভাবে, যখন, যেখানে যে কাজে হাত দিয়েছেন সে কাজকে তিনি গ্রাম, শহর, নগর ছাড়িয়ে একেবারে দেশের আনাচে কানাচে সবারই অন্তরের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

মূল্যবিশ্লেষণ

Page No.
Date.

মূল বিশ্লেষণে আমরা জানতে পারি যে এই বাংলা সাহিত্য ও অতীতের বিস্ময়কর প্রতিভার কবির আরো বহু নিদর্শন আমরা পেতে পারি যা দিয়ে কবিকে একবার নয় হাজার হাজার বার প্রমাণ করতে পারি যে — আমরা কবি নজরুল ইসলামকে বিদ্রোহী কবির আখ্যা দিতে পারি কিন্তু তিনি কোনো অবস্থায় শুধুই বিদ্রোহী কবি নন, তিনি ছিলেন নারীর কবি, প্রেমতত্ত্ব বোধের কবি, প্রকৃতির কবি, সৈনিক কবি, প্রেম-ভক্তি রসের কবি।

এবং আমার মনে হয় আমরা কবিকে বিদ্রোহী কবি বলে শুধু তার পরিধিকে সংকীর্ণ করে দিতে চাইছি, তাকে আমরা বিদ্রোহী কবি বলতে পারি, কিন্তু শুধুই একজন বিদ্রোহী কবি বলতে পারি না, কারণ, তার সৃষ্টির দিকে আমরা নজর রাখলেই এবং উপরিউক্ত কিছু লিখনি দেখলেই তা পরিষ্কার ভেবে পরিস্ফুট হয় যে—

কাজী নজরুল ইসলাম শুধুই বিদ্রোহী কবি নয়।

Teacher's Signature ....